পঞ্চায়েত ও ক্ষমতার রাজনীতি

রতন খাসনবিশ

কিছুদিন আগে সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দেখতে মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে ঘুরছিলাম। ঘোরাটা যেহেতু ছিলো প্রশাসন আয়োজিত, সঙ্গে লোকলস্কর ছিলো বিস্তর। গ্রামের রাস্তায় ধূলোর ঝড় উড়িয়ে পর পর কয়েকটা গাড়ি বিকট শব্দ করতে করতে ব্লক অফিস এবং সেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে আছড়ে পড়লো। প্রত্যাশিতভাবেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো অফিসের কর্মচারী এবং কৌতূহলী গ্রামবাসীদের একটা বড় ধরনের জটলা। জটলার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে দলটি ঘিরে বসলো ভিতরের অফিস ঘরে। ঘরের মধ্যেও অনেক লোক। বাইরে যারা ছিলেন তাঁদেরও অনেকে ঘরের মধ্যে চলে এসে মিটিং -এর কথা শুনতে চান। গ্রাম পঞ্চায়েতে এ ধরনের মিটিং-এ সম্ভবত বাইরের লোক আসতেই অভ্যস্ত। প্রধান দু'একবার হুঙ্কার ছাড়লেন লোক তাড়াবার জন্য। কাজ খুব হ'ল না। মিটিং -এও দেখা গেল, সবারই কিছু না কিছু বলার আছে এবং অধিকাংশ বিষয়েই মতপার্তক্য বিপুল। পঞ্চায়েত অফিসের যিনি প্রধান কর্মচারী, তিনি সরকারী লোক বটেন, তবে তাঁর গলার ওপরে গলা চড়িয়ে কথা বলার লোকও কম নেই। রাইটার্সে অথবা দিল্লীর কোনো মন্ত্রকে এ দৃশ্য অবশ্যই দেখা যায় না। এরকম কিছু ঘটলে কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে বাধাদানের দায়ে অবশ্যই ফৌজদারী মামলা হ'তো। বি.ডি.ও. সাহেবও দেখলাম সামনে তেজে গলা চড়াচ্ছেন। বুঝলাম, এটাই এখানে রীত্বি।

সন্দেহ নেই, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে অনেক বেশি ক'রে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসার কাজটা শ্রেফ মুর্শিদাবাদ অথবা আর একটু প্রসারিত ক'রে ভাবলে পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেছে, এমনটি নয়। একই দৃশ্য দেখেছি কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলে অথবা কেরলার পঞ্চায়েত অফিসে। অতটা বিশৃঙ্খলা অবশ্য নয়— আমি পঞ্চায়েতে গেলে যেটা নজরে আসে সর্বদা। এই নৈকট্য অবশ্যই সর্বরোগহর নয়, বলতে যে ভিতরে আসিও না'র ছবিটা থাকে। সেটা যত মলিন হয়, ততই ভালো। মানুষ অনেক বেশী বুঝতে পারেন, তাঁর উন্নয়নে রাজপুরুষের ভূমিকা কী, কতটা কোনটা হতে পারছে না কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার জন্য। মানুষ যত বেশী এসব বোঝেন, তত বেশী ক'রে রাষ্ট্র - চরিত্র নিয়ে রহস্যটা কমে, মানুষ যেমন চান সে রকম একটা রাষ্ট্র তৈরী হবার পরিস্থিতিও গড়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, এ রকম একটা অবস্থা তৈরী হোক, অনেকেই এটা চাননা। এই অনেকের মধ্যে আমরা অর্থাৎ যারা গ্রামের রাস্তায় ধূলোর ঝড় উড়িয়ে পঞ্চায়েত বিন্যাসের ছবিটা ততই সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়। যত সেটা স্পষ্ট হয় ততই জায়গা নেই। তাঁরা হ'লেন 'প্রজা' এবং যতই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও ক্ষমতার এবং এই প্রক্রিয়ায় যাতে তাঁর অনুমোদন থাকে তার জন্য 'প্রধানের সই', 'কমিটির কোনো অনুমোদন'—এইসবের আয়োজন রাখা হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হোক বা অন্য কোনো নির্বাচিত কমিটি হোক, ক্ষমতা সরানো থাকে এসবের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

কথাটা শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। এই রাজ্যেই কেন্দ্রিয় এবং রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে যা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হয়, তার সংখ্যা ১১০০-র বেশী। এই প্রকল্পগুলির কাজ হয় রাজ্য সরকারের ৪৫টি বিভাগ বা অধিকাংশই ন্যস্ত করা আছে পঞ্চায়েত নয়, বিভাগগুলির আমলাদের হাতে। উন্নয়নের দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা পঞ্চায়েতে হাজিরা দেন না, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা পঞ্চায়েত সভাপতির কথা শুনতে এঁরা বাধ্য নন। এঁরা চেনেন জেলাস্তরের লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিস এবং রাজ্যস্তরের বিভাগীয় আমলাদের। 'পঞ্চায়েতকে জড়িয়ে নেবার একটা ব্যবস্থা আছে, যে ব্যবস্থার মানে হ'ল পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এইসব বিভাগের একটা ক'রে 'পরামর্শদান' -এর কমিটি থাকবে এবং আমলারা খুব দায়ে না পড়লে সেই কমিটির মিটিং -এ আসবেন না। বড় আমলাদের কথা ছেড়েই দিলাম। গণ - স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখার জন্য ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যে 'এ.এন.এম' আছে, অথবা তার যে সুপারভাইজার আছে, সেই সরকারী কর্মচারিটি পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত -এর অফিস মাড়ায় না। প্রতি মাসে এসব নিয়ে একটা মিটিং হয় পঞ্চায়েত স্তরে। সেই মিটিং -এ আসেন দপ্তরের একজন অধঃস্তন কর্মচারী, যাঁর কাজ হ'লো অঙ্গনওয়াড়ির নিরীহ এবং দুর্বল কর্মীদের ধমক দেওয়া এবং একটা ফরমে কিছু শোনা কথা ('কোনো চাইল্ড ডেথ নেই', 'অ্যানিমিক মাদার এর সংখ্যা অমুক', 'হাসপাতাল ডেলিভারির সংখ্যা তমুক') টুকে নেওয়া যেটা জেলার সি.এম ও এইচ - এর অফিসে না পাঠালে তাঁর চাকরির অসুবিধা হবে। প্রাথমিক শিক্ষাও লাইন ডিপার্টমেন্টের হাতে। শিক্ষকের বেতন দেয় শিক্ষা দপ্তর, কর্মী নিয়োগ করে লাইন ডিপার্টমেন্ট। মিড-ডে মিল -এর পর স্কুল ছুটি হয়ে গেলে গ্রামবাসীদের কাছে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এসব দেখার দায় লাইন ডিপার্টমেন্টের, যেখানে আছেন স্কুল ইনস্পেক্টর, যিনি আবার সাধারণ গ্রামবাসীদের ধরা ছোঁয়ার উর্ধে। খাদ্য দপ্তরের কর্তারাও এঁদের হুকুমে চলার পাত্র নন। তাঁরাও চেনেন লাইন ডিপার্টমেন্টের ক্ষমতাবানদের।

পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের কথা যখন হ'য়েছিলো, তখন এটাই ধ'রে নেওয়া হ'য়েছিলো যে কেন্দ্রিয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মতো পঞ্চায়েতও হবে ভারত রাষ্ট্রের আরও একটা সরকার যার হাতে কিছু ক্ষমতা চ'লে যাবে সরকারি। আমাদের সংবিধান যেভাবে কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতা কী, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কী সেটা স্পষ্ট ক'রে লিখেছে, সেভাবেই লেখা থাকবে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কী এবং সে ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য সেই তৃতীয় স্তরের রাষ্ট্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার হাতে। সংবিধান সংশোধন ক'রে যখন রাষ্ট্রে এই তৃতীয় স্তরটির আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হ'লো তখন একই সাথে আর একটি কাণ্ড করা হ'লো— পঞ্চায়েত অফিসে ভিড় ক'রে বসে থাকা গ্রামবাসীদের অধিকাংশই যা জানেন না। রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কী সেটা সংবিধানে স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে, এই ক্ষমতার কোনো অংশ যদি কেন্দ্রিয় সরকার ফিরিয়ে নিতে চায় ত'হলে রীতিমতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে যার জন্য কেন্দ্রের অনুমোদন লাগে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, পঞ্চায়েতের এরকম কোনো স্বাধীন ক্ষমতাই দেওয়া হ'ল না সংবিধানের ৭৩ -তম সংশোধনে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন সংক্রান্ত কী কী কাজ করতে পারে তার একটা লিস্ট (একরাশ তপশীল) যোগ করা হ'ল বটে তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হ'ল যে এই লিস্ট -এর উল্লেখিত কাজগুলোর কোনটা এবং কতটা পঞ্চায়েত পাবে, অথবা আদৌ পাবে কিনা, সেটা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। এর অর্থ, রাইটার্স

-রে মন্ত্রী এবং আমলা কৃপা ক'রে যে কাজটা পঞ্চায়েতকে করতে দেবেন, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হবে ততটাই। সংবিধান যেভাবে রাজ্যর ক্ষমতা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে— যে ক্ষমতায় কেন্দ্র হাত বাড়ালেই হই চই শুরু হ'য়ে যায়, এর সুযোগটা নানা মাত্রায় নিয়েছে এবং নিয়ে চলেছে রাজ্য সরকারগুলি। পরে যার অনেকগুলোই আবার ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল লাইন ডিপার্টমেন্টে। তামিলনাড়ুতে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষমতা পঞ্চায়েতে দেওয়া হ'য়েছে, পশ্চিমবঙ্গ তার ধারে কাছে আসে না। কেরলে রাজ্য সরকার আইন ক'রে প্রতি বছর রাজ্য বাজেটের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত বাজেট ক'রে যে বাজেটের টাকা সরাসরি চলেযায় পঞ্চায়েতে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত বাজেট ব'লে কিছু নেই। বাজেট লাইন ডিপার্টমেন্টের। তা বুঝে নেবে, রাজ্য সরকার যেভাবে নিজের কাজ নিজেই বুঝে নেবার স্বাধীনতা পায়— এই র‍্যাডিকালদের রাজ্যে সে কথাটা উচ্চারণও করা হয় না। সংবিধান যদি এ বিষয়টাতে আরও কড়া হ'তো, কিছু বিষয় নির্দিষ্ট ক'রে পঞ্চায়েতকেই দিযে দিতো, তাহ'লে বোধহয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ নিয়ে এই প্রহসন ঘটতো না। গোটা বিষয়টাই হয়ে পড়ছে রাজ্য সরকারের ইচ্ছা বা মহানুভবতা নির্ভর। এবং বলতে লজ্জা লাগে, এই ইচ্ছা বা মহানুভবতা প্রকাশে যাদের কৃপণতা বেশী, পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার আছে তার প্রথম সারিতে।

তুলনামূলকভাবে বিচার ক'রে বলা যায়, কেন্দ্রিয় সরকার এসব বিষয় অনেক বেশী র‍্যাডিক্যাল। প্রথমতঃ পঞ্চায়েতকে রাষ্ট্রের তৃতীয় একটি ধাপ হিসেবে স্বীকার করার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রিয় সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রিয় ফিন্যান্স কমিশনকে নির্দিষ্ট ক'রেই বলে দেওয়া হয় যে, যে টাকা আগে কেন্দ্র - রাজ্য ভাগাভাগি হ'তো তার একটা অংশ অবশ্যই যেন পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়। (সেটা দেওয়াও হচ্ছে, তবে যেহেতু তা রাজ্য সরকারগুলি মারফৎ, তার সবটা পঞ্চায়েতে পৌঁয়ায় না— পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই)। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রিয় সরকার যে সব গ্রাম - উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয় তার অনেক ক্ষেত্রেই আইনটা এমনই করা হয় যে ওসব প্রকল্পের টাকা খরচ করতে হবে পঞ্চায়েত মারফৎ. এই রাজ্যের রাজ্য সরকার মাঝে মাঝে চিৎকার তোলে, কেন্দ্রিয় সরকার এইসব ক'রে রাজ্যের 'অধিকার'-এ হস্তক্ষেপ করে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানেন, ভাগ্যিস এই 'হস্তক্ষেপ' ঘটে, না হ'লে পঞ্চায়েতগুলোর তবুও যেটুকু কাজ করার অধিকার আছে সেটাও থাকতো না। সবটাই বোধহয় লাইন ডিপার্টমেন্ট হজম ক'রে ফেলতো।

এই রাজ্যে একটা বিশাল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আছে। অত্যন্ত সৎ, পরিশ্রমী, কাজপাগল অফিসার ও কর্মচারী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই অফিস। এঁদের অনেকেই আন্তরিকভাবে অনেক কিছু করতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সবের নিট ফল দাঁড়ায় কিছু 'জি.ও.' অর্থাৎ সরকারী নির্দেশ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে যা প্রায় পনের বিশ দিন অন্তর অন্তর পাঠানো হয়, নিচের অফিসাররা এই জি.' আঘাতে বিধ্বস্ত থাকেন এবং এতো জি.ও. আসে ব'লেই কোনটাতে কী ছিলো, তা মনে রাখতেও পারেন না। অনেকবার ভেবেছি, এত জি.ও-র কারণ কী। ক্রমশঃ মনে হচ্ছে, কারণ এটাই যে ক্ষমতার কোনোটাই যেহেতু পঞ্চায়েতে নেই, সবটাই ওপর থেকে দেওয়া এবং সে কারণে পঞ্চায়েতের সবকিছুই এ রাজ্যে নির্দেশ - চালিত— নির্দেশের গুরুত্ব অপরিসীম এই রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। জি.ও. তাই আসতেই থাকবে এবং জিশপ বিল্ডিং (অর্থাৎ পঞ্চায়েত দপ্তর)-এর বাইরের পঞ্চায়েতি রাজ এই জি.ও. আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হ'তেই থাকবে। অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটা বুঝলাম বাঁকুড়ার একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে। সঙ্গে আছেন দ্বিতীয় রাজ্য ফিন্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান। দ্বিতীয় ফিন্যান্স কমিশন রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, রাজ্য রাজস্বের কিছু টাকা সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়, যেটা তারা তাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী খরচ করতে পারে। ওপর থেকে অনুগ্রহ ক'রে দেওয়া নয়, আইন মাফিক ঐ টাকাটা আসবে রাজ্য কোষাগার থেকে সরকারি পঞ্চায়েতে। কথায় কথায় জানা গেল, এরকম কিছু টাকা তাদের পঞ্চায়েতে পৌঁছেছে বটে, তবে পঞ্চায়েত তা খরচ করে উঠতে পারেনি। কারণ কী? উত্তর পাওয়া গেল, তার কোনো ক্রিটিক্যাল গ্যাপ' খুঁজে পাচ্ছে না, যাতে ঐ টাকাটা কোথাও বরাদ্দ করা যায়। আমি কথাটার অর্থ বুঝলম না। দেখা গেল চেয়্যারম্যানও বুঝতে পারছেন না। তরুণী ডি.পি.ও. যিনি চেয়ারম্যানের পাশে বসেছিলেন, তিনি এবার হাল ধরলেন। জানালেন, একটা জি.ও. আছে, যাতে বলা প্রকল্পের কোথাও টাকা কম থাকলে সেখানে ওটা বরাদ্দ ক'রতে হবে। ঐ পঞ্চায়েত এমন কোনো চালু প্রকল্প খুঁজে পাচ্ছে না, যেখানে এ রকম 'ক্রিটিক্যাল গ্যাপ' আছে। ফলতঃ তারা টাকাটা খরচ করতে পারছে না, চেয়ারম্যান অবাক হ'লেন। আমি অবশ্য অবাক হইনি। টাকা তুচ্ছ, ক্ষমতাটাই আসল, ক্ষমতার কণামাত্র ছাড়া যাবেনা। 'ইচ্ছে মতো খরচ' করতে পারার টাকাটাও তাই 'জি.ও.' দিয়ে বাঁধতে হবে।

কেন এটা ঘটে? রাষ্ট্রের মূল কথাটা ক্ষমতা। এখন যেহেতু উন্নয়নটাও রাষ্ট্রের এজেন্ডায় এসে গেছে, ক্ষমতার একটা বড় অংশ এখন আবর্তিত হয় উন্নয়নকে ঘিরে। ব্রিটিশ যুগে এত কিছু ছিলো না। তখন ক্ষমতা আবর্তিত হ'তো মূলতঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায় ও রাষ্ট্র রক্ষায় সে রাজস্ব খরচ করার ক্ষমতাকে ঘিরে। এখন এসব ক্ষমতাও আছে বটে, তবে পাল্লা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে এই উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ এবং তৎকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতা। সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন, যা থেকে পঞ্চায়েতকে এই উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার কিছুটা দেবার কথা কেন্দ্রের কোনো ক্ষমতাই এই সংশোধনের জোরে পঞ্চায়েতের হাতে আসছে না। রাজ্যগুলোই পড়েছে অসুবিধায়। নানা রাজ্য নানাভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা অর্থাৎ উন্নয়নের কাজ, কাজ করাবার টাকা এবং সেখানে কোথাও, যেমন কর্ণাটকে ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রিকরণ হয়েছে বটে তবে যেটুকু হ'য়েছে সেটায় খুঁত কম আসে। বিহারে এই কাজটা লালু প্রসাদের আমলে আদৌ হয়নি। এখন কিছুটা হয়েছে, তবে যে হ'য়েছে তা যৎসামান্য। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিচিত্র। এখানে পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চায়েতে ভোট করানো হয় নিষ্ঠার সাথে। রাজ্য ফিন্যান্স কমিশনও গঠিত হয় নিয়মিত এবং তার পিরোর্টও জমা পড়ে। এই পর্যন্ত বেশ নিখুঁত। সমস্যা তারপর থেকেই। জেলা পরিষদগুলিতে বেশ কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। তার নীচে ব্লক অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েতেও কাজ বেড়েছে। কিন্তু সবই হ'য়েছে লাইন ডিপার্টমেন্ট বা রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলো যতটা দায় ক'রে দিতে চায়, তার ওপর দাঁড়িয়ে। রাজ্য বাজেটের টাকা কেটে পঞ্চায়েতে চলে যাওয়া— অর্থাৎ পঞ্চায়েতগুলির জন্য আর্থিক বিকেন্দ্রিকরণ ঘটানো— যেটা ঘটলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি নিজের জেরেই দাঁড়াতে পারতো— এ রাজ্যে সেটাই করা হয়নি। ফলতঃ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব টাকা নেই, সুতারং নিজস্ব কাজ নেই এবং ফলতঃ নিজস্ব লোক নেই—এটাই দাঁড়িয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। লাইন ডিপার্টমেন্টের টাকা থাকে,

কাজ থাকে এবং নিজস্ব লোক থাকে, ঐ টাকার খানিকটা পঞ্চায়েতে যায়। তবে তার জোরে পঞ্চায়েত দাঁড়িয়ে আছে, এ ধারণা ঠিক নয়। পঞ্চায়েত মূল টাকাটা পায় কেন্দ্রিয় প্রকল্প থেকে, যে প্রকল্প পঞ্চায়েত মারফৎ রূপদানের বাধ্যবাধকতা রাখা হয় কেন্দ্রিয় সরকার থেকে। ওটা না থাকলে পঞ্চায়েতে বোধহয় তালা ঝুলতো এতদিনে।

বিকেন্দ্রিকরণের এই কাজটা করা হয় না। কেন? একটা কারন তো অবশ্যই এটা যে বিভাগীয় মন্ত্রী এবং আমলারা ক্ষমতা ছাড়তে চান না। তবে এটাও সত্যি যে নিচের স্তরের কর্মচারীরাও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এমনকি জেলা পরিষদের সভাধিপতির আণ্ডারে কাজ করতে চান না। রোগটা এত গভীরে যে এর কোনো সহজ চিকিৎসা নেই। জেলার কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেট, যার হবার কথা ছিলো জেলা পরিষদের সচিব, তিনি জেলা পরিষদের কাজ ছেড়ে দেন এ.ডি.এম. নামক তার চেয়ে নিচু র‍্যাঙ্কের অফিসার -এর হাতে। লাইন ডিপার্টমেন্ট - কেন্দ্রিক কাজগুলোর জেলা স্তরে কর্তা হ'য়ে বসেন তিনি। এছাড়া আছে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব। এখানে ক্ষমতা ও মর্যাদা, দু'টোই বেশি। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা করার দরকারটা কোথায়? বি ডি ও -কে কাজ করতে হয় পঞ্চায়েত সমিতির সচিব হিসেবে। তাঁর কাজ অনেকটাই পঞ্চায়েত কেন্দ্রিক। লাইন ডিপার্টমেন্টের ব্লক স্তরের কর্তারা তাঁর নির্দেশ শুনতে বাধ্য নন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনো কথাও তাঁর নেই, যেটা এস.ডি.ও. বা ডি. এম.-এর আছে। এই অফিসারটিকে পঞ্চায়েত নিয়েই থাকতে হয়। গ্রামবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচি সহ্য করতে হয়। তবে যে সুখ স্বপ্ন নিয়ে তিনি নিদ্রা যান তা হ'ল কিছুদিন পরে তিনি বদলি হ'য়ে যাবেন কোনো এক লাইন ডিপার্টমেন্টে যেখান ক্ষমতা ও মর্যাদা তুলনামূলকভাবে বেশী, যেখানে আছে আসল রাষ্ট্র ক্ষমতা।

এই ব্যবস্থার মধ্যেই চলে পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামোন্নয়নের কাজ, যে কাজ দেখতে গ্রামের রাস্তার ধূলোর ঝড় উড়িয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেন বিশেষজ্ঞরা। গ্রামবাসীরা প্রকল্পের রূপায়ণ কীভাবে করেছেন, সেটা তাঁরা রিভিউ করেন। যেটুকু ক্ষমতা তাঁদের স্তরে ন্যস্ত করা আছে বিশেষজ্ঞরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেন, সে ক্ষমতা ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। এই ক্ষমতার গুরুভার বহন করার 'ক্যাপাসিটি'কতটা চুরি বাড়ে, ফিরতে ফিরতে সেটা নিয়েও লঘু গুরু আলোচনা চলতে থাকে। এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একদল থাকেন, যাঁরা এসব করেন খুবই আন্তরিকভাবে। সত্যি সত্যিই 'ক্যাপাসিটি' বাড়ুক এই স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির —এটা এঁরা চান। টাকা চুরির সমস্যাটাও এঁরা সৎভাবেই সমাধান চান, কারণ, এঁরা নিজেরাও সৎ। সমস্যা একটাই এরা বুঝতেই পারেন না বেঁচে থাকার যুদ্ধে যে মানুষেরা নিজেদের ক্যাপাসিটি দুবেলা প্রমাণ করেন— তাঁদের 'ক্যাপাসিটি' নিয়ে এত চিন্তা না করলেও চলে। চুরির ঘটনাও যে কমে এটাও তাঁদের নজর এড়িয়ে যায়। লাইন ডিপার্টমেন্টে ঘুষের ব্যবস্থাটি যে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়ে গেছে, তার কারণ 'ভিতরে আসিও না' সাইনবোর্ডটি। পঞ্চায়েতে এই সাইনবোর্ডটি মুছে দেবার চেষ্টা চলে। চুরি ঠেকাবার সেটাই যে শ্রেষ্ঠ পথ, এটা ভাবতে চান না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দোষ দিই না। অন্য রকম রাষ্ট্র যে হ'তে পারে, এঁদের মনোজগতে সেটাই অনুপস্থিত। এঁরা সৎ, কিন্তু র‍্যাডিকাল নন— সেটাই এঁদের সমস্যা।

আর একদল আছেন, যাঁরা এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে গিলতে বাধ্য হ'য়েছেন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে। এটাকে ঘিরে তাঁদের আছে বিক্ষোভ, নির্লিপ্ততার মুখোশ এঁটে যে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আটকে রাখেন এঁরা। আমলাদের একটা বড় অংশ এই দলভুক্ত। এদের মধ্যে যাঁরা সিনিয়র, লাইন ডিপার্টমেন্ট ক্ষমতা ধ'রে রাখার কাজটি তাঁরা করেন আশ্চর্য কুশলতায়। আর জুনিয়র সদস্যরা এঁদের হাত ধরেই ট্রেনিং নিতে থাকেন, কীভাবে এই ক্ষমতা রক্ষার কাজটি জীবন শৈলীর অঙ্গ করে নেওয়া যায়।

এই রকম এক জুনিয়র সদস্যর কথা ব'লেই এ আলোচনা শেষ করি। গিয়েছিলাম বর্ধমানের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্লক অফিসে। জেলা সদর থেকে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিলো, ঐ ব্লকে কিছু মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠি বেশ ভালো কাজ করছে, আমরা যেন অবশ্যই ওদের সঙ্গে দেখা করি। ব্লকে পৌঁছে দেখলাম, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার একজন আই.এ.এস. তরুণী। সদ্য চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এম.এস.সি করে এই বাঙ্গালী তরুণীটি আই.এ.এস. পরীক্ষা দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে যোগ দেন। অ্যানেমিক চেহারার গ্রামের মেয়েরা যখন তাঁদের স্বনির্ভর গোষ্ঠির কাজ বুঝিয়ে বলছিলেন, মহিলাটি সারাক্ষণ উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলেন। আমরা ওঁকে দু'একটা প্রশ্ন করলাম। উনি সযত্নে 'স্যার' শব্দটি এড়িয়ে গেলেন। বুঝলাম, ইতিমধ্যেই তাঁর এই ট্রেনিং হ'য়ে গেছে যে সিনিয়র আই.এ. এস এবং মন্ত্রী ছাড়া কাউকে তিনি আর 'স্যার' বলবেন না। জবাব যা দিলেন তাতে বুঝলাম, এই মহিলারা কনফেডারেশন গড়ে ব্যাঙ্কের টাকায় নিজেদের মধ্যে লেনদেনের জন্য একটা ব্যাঙ্ক খুলছেন সেটা তিনি জানেন না; ওটা করা যায় কিনা, জিজ্ঞেস করতে জবাব পেলাম 'সেটা ব্যাঙ্ক বুঝবে'। দলে একজন সিনিয়র আমলা ছিলেন। মিটিং -এর পর মহিলাটি দ্রুত আমাদের ছেড়ে ঐ ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, তখন শুনলাম, ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন, 'ব্লক পোস্টিং আর কদ্দিন'? শুনলাম 'পঁচিশ দিন আর আছে স্যার'। বাৎসল্য রসে ভেজানো গলায় মন্তব্য এলো, 'তাহ'লে তো প্রায় মেরে এনেছো'।

এরা এইভাবে ব্লক পোস্টিং -এর সময়সীমা দিন কিংবা ঘন্টা দিয়ে মাপতে শেখে সিমলায় ট্রেনিং নিয়ে ফিরবার সাথে সাথে। সিমলায় আরও বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যত ভারত শাসন করবে তোমরা। এই শাসন বলতে যে উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনও বোঝায়, সেটাও বোঝানো হয় বারে বারে। তারপর এরাই বসে শাসন কেন্দ্রে। অ্যানেমিক চেহারা স্বনির্ভর গোষ্ঠির মহিলার সঙ্গে মিটিং করার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় অতি দ্রুত। অন্য এক ভারতবর্ষে চলে যায় এরা অতি দ্রুত, যেখানে প্রজার ভারত হ'য়ে পড়ে দূরের ভারত।